হার্বাল চিকিৎসার নামে প্রতারণা

অষ্টম শ্রেণী পাস 'ডাক্তার' দেয় সর্বরোগের দাওয়াই!

রিপোর্ট : **সাজেদুর রহমান**

আশীষ কুমার গুহ। মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার আমলসার গ্রামের এক দরিদ্র যুবক। সংগীতশিল্পী হিসেবে এলাকায় তার সুনাম আছে। পুরনো ব্লেডে নখ কাটতে গিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সময়মতো পরিচর্যা করেননি ক্ষত সারানোর জন্য। ফলে এক পর্যায়ে তা অনেক বেড়ে যায়। বাধ্য হয়ে যশোরে ডাক্তার দেখালে তারা বলেন, এ রোগ কঠিন। গোটা দেহে গ্যাংরিন ছড়িয়ে পড়েছে। চিকিৎসার জন্য ঢাকা সরকারি পঙ্গু হাসপাতালে এসে থাকা ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে খরচ হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। তবে কাজ একটু হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, পুরো শরীর নয়, দুটো পা কেটে ফেললেই চলবে। হতাশ আশীষ হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি ফিরছিলেন, সেদিনই গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে একটি লিফলেট পান। তাতে লেখা আছে, '...জীবনের শেষ চিকিৎসা মনে করে আমার চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাই। অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট দ্বারা ব্যবস্থামতে ১০০% গ্যারান্টিসহকারে ওষুধ তৈরি করে দেয়া হয়। ...এই মঘার ওষুধ ব্যবহার করিয়া উপকার পাননি বলিয়া যদি ঈমানে বলেন, আমি ঈমানে বলিতেছি মূল্য ফেরত দিব।' বিজ্ঞাপনের কথা আশীষের মনে ধরে। লিফলেটের ঠিকানা অনুযায়ী সেই দিনই 'মঘা ঔষধালয় (ঢাকা)' নামে ওই চিকিৎসা কেন্দ্রে যান। সময়টা তখন ছিল জুলাই ২০০৪।

ঔষধালয়ে পৌঁছালে চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান জেএ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়। চিকিৎসক তার অসুস্থতার কথা শোনে এবং গ্যারান্টিসহকারে চিকিৎসা দিতে সম্মত হয়।

চিকিৎসা বাবদ সে আশীষের কাছ থেকে সেদিন ২ হাজার টাকা নেয় এবং বলে আরো ১৫ হাজার টাকা দিলে পা-টাকে পুরো স্বাভাবিক করে দেবে। চিকিৎসা শেষে পা ভালো হলে আরো ৩ হাজার টাকা দিতে হবে চিকিৎসা ফি বাবদ। কারণ প্রথম ২ হাজার এবং পরের ১৫ হাজার পুরোটাই যাবে ওষুধের পেছনে। ওষুধগুলো তৈরি করবে দেশ-বিদেশের অনেক মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া দিয়ে।

সদ্য গ্রাম থেকে আসা সরল আশীষ বিশ্বাস করেন এবং মঘা ঔষধালয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। ঔষধালয় তখন গ্যারান্টি দিয়েছিল ৬ মাসের মধ্যে আশীষ সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন। আশীষ বিস্ময় নিয়ে এই প্রতিবেদককে বলেন ১৭ হাজার টাকা নিলেও আজ ৮ মাস হতে চললো পা তো ভালো হয়নি, উল্টো আরো ক্ষতি হয়েছে। পায়ের মাংস পচে খসে যাচ্ছে। এ অবস্থায় মঘা ঔষাধালয়ে গেলে তারা আশীষকে তাড়িয়ে দেয়। সব প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকার করে। আশীষ পুনরায় সরকারি পঙ্গু হাসপাতালে যান। সিদ্ধান্ত নেন, পা কেটে ফেলেও যদি জীবন বাঁচানো যায়।

ঘটনা-২

ঝিনাইদহ জেলার চরপাড়া গ্রামের ফজলুল হক মন্ডল। পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস্ট্রিকে ভুগছেন। ঝিনাইদহ, যশোর এমনকি ঢাকায়ও অনেক ডাক্তার দেখান। রক্ত-মলমূত্র পরীক্ষা করা হয়েছে কমপক্ষে কুড়িবার। এক্স-রে, আল্টাসনোগ্রামও অনেকবার করানো হয়। এতো খরচে যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন, তখন একদিন ঢাকার রাজপথের একটি লিফলেটে আকৃষ্ট হয়ে এক ভন্ড ডিগ্রিহীন ক্যানভাসারের খপ্পরে পড়েন। তার সর্বরোগের চ্যালেঞ্জ দেয়ার কথার ফুলঝুরিতে মুগ্ধ হয়ে আরো কিছু টাকা খোয়ান। শেষকালে নিরাময়হীন জীবন নিয়ে কর্মহীন বসে শুয়ে কাটাচ্ছেন।

পত্র-পত্রিকায় আকর্ষণীয় ভেলকিবাজি বিজ্ঞাপন ও ছবি ছাপিয়ে কিংবা লিফলেট বিলি করে একশ্রেণীর প্রতারকরা চিকিৎসার নামে আশীষ বা ফজলুল হকের মতো অনেক রোগীকে কাছে টানতে সক্ষম হচ্ছে। এসব চিকিৎসকের না আছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, না আছে শাস্ত্রজ্ঞান, না আছে সরকারি কোনো

স্বীকৃতি। আইনে এদের কঠিন শাস্তির বিধান থাকলেও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রকদের নাকের ডগায়, চোখের সামনে এরা শাহী হালে মানুষ ঠকানোর কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। গড়ে উঠেছে ভুয়া চিকিৎসালয় ও ভেজাল ওষুধের ছোট ছোট কারখানা। ভুয়া প্রতারক চিকিৎসক আর ওষুধ কারবারি মিলে চালাচ্ছে ব্যবসা।

এক সময় ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে বাবা জাহাঙ্গীর হোসেন বেঙ্গমানের (ডিগ্রি নাই) প্রসার ছিল প্রবল। নামের শেষে 'বেঙ্গমান' এবং 'ডিগ্রি নাই' জুড়ে দিয়ে রোগী ঠকানোর বেঙ্গমানি প্রকাশ্যে চালিয়েও আইনের বেড়াজালে জড়ানোর ভয় তেমন ছিল না।

বর্তমানে এ ধরনের 'বেঙ্গমানদের' সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে। গণস্বাস্থ্যের মহাপরিচালক ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী বলেন, এই বেঙ্গমানরা কেউ আয়ুর্বেদ, কেউ হেকিম সেজে দাওয়াখানা, কেউ কবিরাজ হয়ে গাছ-গাছড়ার, কেউ হোমিও ইত্যাদি সাইনবোর্ডে মানুষকে আকৃষ্ট করে। পত্রিকায় অশ্লীল ও যৌনরোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দিয়েও এরা মানুষ ঠকানোর কাজে মত্ত রয়েছে। তিনি এ ধরনের কয়েকটি জালিয়াতি ও টাউট প্রতিষ্ঠানের নাম এবং কর্মকান্ড উল্লেখ করে আরো বলেন, বাজারে আর দশটি পণ্য কিনতে ক্রেতারা যত দ্বিধা করে, ওষুধ ও ডাক্তারের ব্যাপারে একটুও দ্বিধা করে না। সরল বিশ্বাসে ডাক্তারের নামে প্রতারকদের দেয়া ওষুধ তারা কিনছে অবলীলায়। যার ফলে অসংখ্য মানুষ প্রতারিত হচ্ছে প্রতিদিন।

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সরকারি হাসপাতালের শরণাপন্ন হয়। সেটাই তাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেখানে অযথা হয়রানি ও অযত্নের কারণে অনেকেই হেকিম, বৈদ্য-ওঝা, পীর-ফকির, ইউনানি-আয়ুর্বেদসহ নানা চিকিৎসা নিতে গিয়ে প্রতারিত হচ্ছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাটে-বাজারে এ চিকিৎসার নামে চলছে প্রতারণা।

গাবতলী গরুর হাটের প্রান্তিক সুপার মার্কেটের নিচতলায় চট্টগ্রাম ঔষধালয়। সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'ইউনানী ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিশুদ্ধতম প্রতিষ্ঠান। যৌন রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র'।

দাওয়াখানায় ঢুকে দেখা গেলো ছোট্ট একটা কক্ষকে হার্ডবোর্ড দিয়ে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছে। একটা অংশের একপাশে সেল্ফের তাক ও টেবিলে বেশ কিছু এলোপ্যাথ ওষুধ। আর খবরের কাগজ দিয়ে মোড়ানো থরে থরে সাজানো ২০-২৫টি বোতল। বোতলগুলোতে আদৌ কিছু আছি কি না বোঝা যাচ্ছে না। প্রতিবেদক ভেতরে ঢুকতেই দু'জন লোক বের হয়ে গেলো। আরেকজন একটা চেয়ারে বসে প্রতিবেদককে বসতে বললো। 'কোথা থেকে আসছেন?' 'কালিয়াকৈর থেকে চাকরির জন্য এসেছি। জটিল আমাশয়ে ভুগছি।'

'শুধু ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ভিজিট ১০০ টাকা, আর চিকিৎসা নিতে চাইলে অন্য কথা।' অন্য কথাটা কি জানতে চাইলে বললো, 'শুধু ওষুধের দাম দিলেই চলবে। ডাক্তারের ফি লাগবে না।' চিকিৎসা সেবা নেবো জানাতে পাশের ডাক্তারের কক্ষে যেতে বলল। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল, অপেক্ষাকৃত কম বয়সী এক যুবক ডাক্তারের আসনে বসে আছে। চুল এলোমেলো, চোখ ফোলা, লাল, পোশাকে মলিনতা স্পষ্ট। রোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত শুনে বললো, 'আপনার অম্বল আমাশয় হয়েছে। ডাক্তারি ভাষায় বলে ক্রনিক আমাশয়। এর জন্য তেলায়েশাহী দাওয়াই লাগবে। হিমালয়ের পাথরের প্রাকৃতিক নির্যাস, প্রাচীন অনুসন্ধান এবং আধুনিক গবেষণার অপূর্ব মিলন এই তেলায়েশাহী। এই দাওয়াই আপনার অম্বল আমাশয় তো সারাবেই, অতিরিক্ত আপনার রগে রগে শক্তি যুগিয়ে যৌবনকে রাখবে অপ্রতিহত।' বিস্মিত হয়ে বললাম, 'বাহ্ একের মধ্যে দুই।' দাম জানতে চাইলে ডাক্তার বলল, 'এক দাম ২৩০ টাকা। অত টাকা নেই জানালে কত আছে জানতে চায়। পঞ্চাশ টাকার কথা বলায় ডাক্তার নিরাশভাবে না সূচক ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে চলে যাবার ইঙ্গিত দেয়। উঠতে গেলে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার কাছে কি সত্যি আর টাকা নেই?' উত্তর না দিয়ে উঠে দরজার কাছে যেতেই ডাক্তার ঝট করে উঠে গতিরোধ করে বলে, 'আরে ভাই দাঁড়ান। যাচ্ছেন কেন। যা আছে দিয়া যান, বাকি টাকা পরে দিয়ে যায়েন'। 'সর্বোচ্চ ২০ টাকা দিতে পারি। বাকিটা দিয়ে বাড়ি ফিরবো' জানাতে ডাক্তার বলল, 'বিশ টাকা দেন ওষুধ নিয়ে আসি।' কোথা থেকে আনবেন? ডাক্তার বললো, '১ নম্বর (মিরপুর-১) আহমদনগর, ছলিম উদ্দিন মার্কেট, কর্ণফুলী, বাড়ি নং ১৬০/১। ওখানে পূর্বপাশে আমাদের ল্যাবরেটরি আছে। ওখান থেকে আনতে হবে।' টাকা দিয়ে ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর ডাক্তার পদবিধারী ঐ লোকটি পলিথিন মোড়ানো ওষুধ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'প্রতি রাতে শোয়ার আগে ওই ওষুধের এক-তৃতীয়াংশ ভালো করে চিবিয়ে খেয়ে নিতে হবে। এরপর ঠান্ডা পানি এক গ্লাস খেতে হবে। তবে ঠান্ডা পানির বদলে একটা বর তাম্বুরার সঙ্গেও খাওয়া যায়।' বর তাম্বুরা কি জানতে চাইলে বলে, 'পান-কে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে বর তাম্বুরা বলে।' ওষুধটা নিয়ে ঢাকা ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে দেখানো হলে তারা সেটাকে

হারবাল কোম্পানির এমএলএম প্রতারণা

গ্যানেক্স বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, ডিএক্সএন হেলথ (বিডি) লিঃ, এমএক্সএন মডার্ন হারবাল ফুড লিঃ, ডিএক্সএন জেসান বাংলাদেশ প্রাঃ লিঃ এবং বাও কাং হেলথ্ কেয়ার ইন্টাঃ কোঃ লিঃ নামের ৫টি হারবাল ওষুধ কোম্পানি অপচিকিৎসার পাশাপাশি প্রতারণার নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এর মধ্যে ডিএক্সএন দেশীয় এবং চীনা গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরি করে। আর বাকিগুলো মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা থেকে তৈরি করা বিভিন্ন ক্যাপসুল-ট্যাবলেট মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করে এ দেশে বিক্রি করছে। এছাড়া ব্রেনটনিক, যৌবন উদ্ধার টনিক, ম্যাসেজ ওয়েল, কফিও বিক্রি করে থাকে। কোম্পানিগুলোর দাবি অনুয়ায়ী, এইডস ছাড়া বাকি সব রোগের ওষুধই নাকি তাদের কাছে রয়েছে, যা স্রেফ প্রতারণা।

তবে সম্প্রতি এদের প্রতারণার সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে শিক্ষিত বেকার ছেলে-মেয়েরা। এদের দিয়ে প্রতারণামূলক মাল্টিলেভেল মার্কেটিং (এমএলএম বা ডাইরেক্ট সেলিং) পদ্ধতিতে কোম্পানিগুলো হারবাল ওষুধ বিক্রি করে থাকে। এ যেন জিজিএন ডেসটিনির আরেক রূপ! প্রথমে তারা বিভিন্ন সেমিনারে এসব ক্রেতা-পরিবেশককে বলে থাকে, এমএলএম পদ্ধতিতে এসব ওষুধ বিক্রি করে তারা রাতারাতি ধনী হয়ে যাবে। মূলত এই লোভে পড়েই রোগী না হয়েও তারা ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা মূল্যে হারবাল ওষুধ কিনে ক্রেতা-পরিবেশক হয়ে থাকে। তারপর তাদের মতো আরো ক্রেতা-পরিবেশক যোগাড় করে দেয় কোম্পানিকে। এর বিনিময়ে কোম্পানিগুলো তাদের মোটা অঙ্কের কমিশন দিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এসব হারবাল কোম্পানি ওষুধ বিক্রির নামে প্রতারণামূলক এমএলএমের তথাকথিত ইউনিলেভেল পদ্ধতিতে স্রেফ জুয়া খেলছে। এ কারণে পাকিস্তানে গত বছর নিষিদ্ধ হয়েছে আপন (প্রাঃ) লিমিটেড নামের একটি এমএলএমভিত্তিক হারবাল কোম্পানি। আর অবৈধভাবে ব্যবসার দায়ে জেনিয়াল হেলথ্ প্রোডাক্টস (প্রাঃ) কোম্পানিকে ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৫০০ রুপি জরিমানা করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

মুশকিল আসান

ধর্ম বিশ্বাসকে পুঁজি করে আধ্যাত্মিকতার নামে একশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান চুটিয়ে ব্যবসা করছে 'মুশকিল আসানের'। পত্রিকার পাতায় বিভিন্ন মানুষের ছবি ছাপে যারা উপকৃত হয়েছেন। এ রকম কয়েকজন বিল্লাল হোসেন, বিলকিস বেগম এবং রিজিয়া বেগমের ঠিকানা অনুযায়ী খোঁজ নিয়ে তাদের কাউকে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে আলাপ করলে আদি ও আসল দরবারে মা, খানকা-ই চিশতিয়া দরবার শরীফ এবং আজমিরী দরবার শরীফ নামধারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা ঠিকানা জানে না। পত্রিকায় নাম ও এলাকার নাম উল্লেখ থাকলেও কোনো বাড়ির নম্বর উল্লেখ করা হয় না। এছাড়া বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন রকম দোহাই দেয়া হয়। এই দোহাই হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় আজমির শরীফের নাম। পুরুষ বা মহিলা যারাই এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত তারা সবাই নিজেকে আজমির শরীফের খাদেম বলে দাবি করেন। হজ করে এসেছেন বলে দাবি করেন। বিজ্ঞাপনে মুশকিল আসানের ১০০ ভাগ গ্যারান্টি দেয়া হয়।

ইদানীং যোগ হয়েছে পবিত্র কোরআনের আয়াত ব্যবহার করার প্রবণতা। 'নূরে শেফা' নামের একটি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনে 'কোরআন শরিফের ৫৩ পৃষ্ঠায়' উল্লেখ আছে বলে বিজ্ঞাপন দেয়। সুরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ না করে পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে এদের মিথ্যাচার প্রমাণিত হয়। কারণ, বিভিন্ন আকার-আকৃতির কোরআন থাকায় ৫৩ পৃষ্ঠায় একেক কোরআনে একেক আয়াত রয়েছে। আরেকটি প্রতিষ্ঠান মাত্র ৭ ঘণ্টায় সাফল্য লাভের ঘোষণা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়। এসব রকমারি বিজ্ঞাপনে ভুলে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমায় এসব বাহারী নামের প্রতিষ্ঠানে। দর্শনে মুক্তি, দরবারে নূরানী, রাজরত্ন ঘর, খানকায়ে চিশতিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠান এখন ঢাকার অলি-গলিতে। সূফী বাবা, কেবলা বাবা, সর্পসম্রাট- এসব বিশেষণ প্রায় সবার। মক্কা-মদীনা, কামরূপ-কামাখ্যা, আজমির শরীফে সবাই দীর্ঘদিন তপস্যা করে এসেছেন। কয়েক যুগের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়। অথচ এদের অনেকেই ব্যবসা করছেন কিছুদিন আগে থেকে। এ ব্যবসায় এগিয়ে এসেছে মমতাময়ী মায়েরাও। আগে এদের সংখ্যা অল্প থাকলেও সম্প্রতি তা বেড়েছে। খানকায়ে শেফা, দরবারে মা, মায়ের আশীর্বাদ, হরফে জান্নাত- এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বসেন খেলাফতপ্রাপ্ত বুজুর্গ মায়েরা।

মনের মানুষকে বশ করা, স্বামী-স্ত্রীর অমিল, পাওনা টাকা ফেরত, চাকরি লাভ, পদোন্নতি, ব্যবসায় উন্নতি, অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য করাসহ যেকোনো ধরনের সমস্যার সমাধান করে দেয় এই প্রতিষ্ঠানগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িতদের সমস্যার সমাধান কতোটা করতে পারছেন তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলাম আমরা। খানকায়ে শেফার সুফিয়া বেগম স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটালেও তার নিজের স্বামীর সঙ্গে মিল নেই। একাধিক বিয়ে করায় তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। যদিও তিনি এই ব্যবসা শিখেছেন স্বামীর কাছ থেকেই। 'আজমিরী পাথর ঘর' নামে তার স্বামীর রয়েছে এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই পরিবারের যাত্রা। এখন স্বামী-স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বউ, মেয়ে সবাই মিলে চালিয়ে যাচ্ছেন এই ব্যবসা।

এই প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়ে উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ

তেঁতুলপোড়া ও ময়দার একটি মিকশ্চার বলে অভিহিত করেন। বিশেষজ্ঞ ডা. এবিএম ইউনুস বলেন, 'এই ওষুধ কোনো প্রকার আমাশয়ের নিরাময় তো করবেই না, বরং পেটের পীড়া আরো বাড়াতে পারে।'

ঢাকা শহরে এ ধরনের চিকিৎসক ও চিকিৎসালয়ের সংখ্যা কতো তা সঠিক করে কেউ বলতে পারে না। তবে প্রায় প্রত্যেক পাড়া-মহল্লায় এ ধরনের চিকিৎসক ও চিকিৎসালয় আছে। কোনো কোনো চিকিৎসক বিনা বিজ্ঞাপনেই এ ব্যবসা করে আসছে। শনির আখড়ার হেকিম তালেব জাফরানী বাড়ির সামনে ছোট্ট করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে এ ব্যবসা করছে দীর্ঘদিন। জাফরানী দাবি করে যে তার খ্যাতি বহু দূর বিস্তৃত। তাই সে বিজ্ঞাপনে যায় না। অনুসন্ধানে জানা যায়, সায়েদাবাদসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে জাফরানির বেশ কিছু ভাড়া করা লোক থাকে। তারা সুযোগ ও অবস্থা বুঝে রোগীদের পাঠিয়ে থাকে। রোগী প্রতি শতকরা ২০ থেকে ৩০ কমিশন পায় তারা।

কিছু ঠিক, কিছু ঠিক না

শান্তিনগর মোড়ের 'কোয়ান্টাম মেথড' অফিসটা চোখে পড়ে সবার। সুন্দর ভবনে বিশাল সাইনবোর্ড। এই কোয়ান্টাম মেথডের একটি বুলেটিনে দেশবরেণ্য অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদারের ছবি। তাতে লেখা- এই অভিনেত্রীর পায়ে দীর্ঘদিন ব্যথা ছিলো। এখানে আসার পর চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। বুলেটিনে এ বক্তব্য দিয়ে যেন প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, দেখো আমরা কতো বড় কার্যকর প্রতিষ্ঠান। তাই এখানে সবাই আসুন। তাদের বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে : প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য লাভের জন্য পরীক্ষিত বিশ্বের সর্বাধুনিক মেডিটেশন ও আত্মউন্নয়ন পদ্ধতি।

কোয়ান্টাম মেথডে গেলে দেখা যায় ৫ বছরের শিশু থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধকে এককাতারে বসিয়ে মোহনীয় কায়দায় কথা বলছেন মহাজাতক শহীদ আল বুখারি। (মহাজাতক দৈনিক আজাদ পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন বলে তিনি জানান) শহীদ আল বুখারির সম্মোহনী শক্তি আছে বলে স্বীকার করলেন অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার। তিনি জানান, 'ওদের কথা কিছু ঠিক কিছু ঠিক নয়। তারা যা করছে তা সাময়িক। স্থায়ী ও সায়েন্টিফিক নয়। আমাদের মতে, সংসারী মানুষের পক্ষে ওদের নিয়মে চলা সম্ভব নয়।'

লিফলেটে বর্ণিত পায়ে ব্যথা প্রসঙ্গে অভিনেত্রী জানালেন, 'আমার সাময়িক উপশম হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে ভারত থেকে আমি স্থায়ী চিকিৎসা করিয়ে এনেছি।'

ভুক্তভোগী তরুণ শাহরিয়ার অভিযোগ করলেন। এই কোয়ান্টাম মেথডের মেডিটেশনের বাইরে আর একটা ব্যবসা ওরা করে- রক্তের প্লাটিলেট ও হোয়াইটসেল বিক্রি। সাধারণ মানুষ কোয়ান্টাম মেথডে এলে তাদের প্রভাবিত করে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করে। সেই বিনে পয়সার রক্ত থেকে প্লাটিলেট ও হোয়াইটসেল আলাদা করে বিক্রি করে। প্রতি ব্যাগে খরচ ১০০ টাকা হলেও বিক্রি করে ৬০০ টাকা। কখনো কখনো সুযোগ বুঝে আরো বেশি দরেও বিক্রি করে। এভাবে দৈনিক তারা ৩ থেকে ৪শ'

নিশ্চয়তা দিয়ে কাজ করলেও নিজেরা চালাতে না পেরে বন্ধ হয়ে গেছে 'দর্শনে মুক্তি' এবং 'হরফে জান্নাত' নামের দুটি প্রতিষ্ঠান। যারা অন্যদের ব্যবসায়ে উন্নতি ঘটান তাদেরই নিজেদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! আবার নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি অনুযায়ী ফল না পেয়ে 'বিফলে মূল্য ফেরত' বিশ্বাস করে অনেকে যায় টাকা ফেরত চাইতে। তখন সম্মুখীন হয় নতুন ধরনের প্রতারণার। বাণ-টোনা, গলায় রক্ত উঠে মরে যাওয়ার হুমকি দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক লাঞ্ছনা ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়ার ঘটনা ঘটে। এভাবে প্রতিনিয়ত শত শত মানুষ প্রতারিত হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই প্রতিনিধি রোগী সেজে গিয়েছিলেন এ রকম একটি প্রতিষ্ঠানে। দুই রুমের অফিস, প্রথম রুমে সেক্রেটারি এবং ভেতরের রুমে হুজুর। সেক্রেটারির কাছে সমস্যার বৃত্তান্ত জানানোর পর সে একটি স্লিপ ধরিয়ে দিল। হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার স্লিপ। এর হাদিয়া ৩১০ টাকা। হুজুরের রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সালাম দিলাম এবং হুজুর বললো, 'ঘাবরাও মাৎ, তোর সমস্যা আমি জানি, মনের মানুষকে পেয়ে যাবি। ঠিক জায়গায় চলে এসেছিস, আর কোনো চিন্তা নাই। আইজ রাতে তোরে নিয়া এস্তেখারায় বসবো। তোর সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইব।' আমি এই কথায় মোটেও অবাক হলাম না। কারণ, আমি এই রুমে আসার আগে সেক্রেটারিকে ইন্টারকমে হুজুরের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। বুঝলাম তখনই হুজুরকে সমস্যার কথা জানানো হয়েছে। হুজুর বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি ঘরে আনতে চাস, টাকা তত বেশি লাগবো। পাগল হইয়া চইল্যা আসবো তোর ঘরে। টাকা-পয়সা সব ঠিক আছে তো?'

এভাবেই সাধারণ মানুষ এসব প্রতিষ্ঠানে ঢোকে এবং প্রতারণার শিকার হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হুজুরের নজরানা একেক রকম। হুজুরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য এই নজরানা সবাইকেই প্রদান করতে হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে কয়েক দিন ঘুরে এবং কর্মরত কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এদের অধিকাংশ রোগী প্রবাসী। এই প্রবাসীদের বেশির ভাগই থাকে মধ্যপ্রাচ্যে। বিদেশ থেকে চিঠি কিংবা ফোনের মাধ্যমে হুজুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠায়। আর চিকিৎসা পার্সেল করে দেয়া হয়। দেশের ভেতরে যারা রোগী হিসেবে আসে এসব প্রতিষ্ঠানে, তাদের বেশির ভাগই অসহায় মানুষ। নিজের চেষ্টায় কোনো কিছু করতে না পেরে বিশ্বাস আনে আধ্যাত্মিকতায়। এছাড়া মিডিয়া জগতের অনেক তারকা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সরকারি আমলা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরও আগমন রয়েছে এখানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এক ভিসির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিলো এ রকম এক প্রতিষ্ঠানে। বিভিন্ন স্তরের এসব মানুষ আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে বলেই এসব প্রতিষ্ঠান প্রতারণার বৈধতা পায়। এসব প্রতিষ্ঠিতদের সমস্যাগুলো অন্য রকম এবং এরা হাতের আংটিতে ধারণ করে বিভিন্ন পাথর। বিভিন্ন রাশির সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন রঙের এই পাথরগুলো আজমিরী পাথর নামে পরিচিত। এগুলোর রয়েছে বিভিন্ন নাম। ১০ হাজার, ১৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয় এসব আংটি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাম বেড়ে দ্বিগুণ-তিন গুণ হয়ে যায়।

রোগীর জন্য যেসব পথ্য তৈরি করা হয় তার উপাদানগুলো সচরাচর পাওয়া যায় না। পেস্তা বাদাম, কাবুলি বাদাম, গাঁজা ফুল, বিভিন্ন লতাপাতা এবং গাছের শেকড়ের কথা উল্লেখ করে রোগীকে কিনে আনতে বলা হয়। রোগী অপারগতার কথা জানালেই মোটা অঙ্কের টাকা চেয়ে নেয়া হয় এসবের বরাত দিয়ে। হুজুরের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে যেকোনো নির্দেশ পালন করে এসব রোগী। রফিক নামের এক ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হুজুরের নির্দেশে মনের মানুষকে পাওয়ার জন্য সারা রাত পানিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন শীতের রাতে। হুজুর তখন তাকে নিয়ে এস্তেখারায় বসেছিলেন।

সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ভীতিকে কাজে লাগিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান দিনে দিনে তাদের ব্যবসা প্রসারিত করছে। কাকরাইল, শান্তিনগর, পল্টন, বনানী, গুলশানে এই প্রতিষ্ঠানগুলো চোখে পড়ে বেশি। সারা ঢাকাতেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এ রকম নানা প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়মিত বখ্‌রা প্রদান করায় কোনো বাধা ছাড়াই এই প্রতিষ্ঠানগুলো অবলীলায় ব্যবসা করে যাচ্ছে। এই ব্যবসা একদিকে কোটিপতি করে দিচ্ছে তাদের, অন্যদিকে প্রতারণায় নিঃস্ব করে দিচ্ছে অনেক সাধারণ মানুষকে। মানুষের অসচেতনতা এবং প্রশাসনের নির্লিপ্ততার ফলে প্রতিনিয়ত ফায়দা লুটে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো।

– অলিন্দ রহমান

ব্যাগ রক্ত গ্রহণ করে এবং বিক্রি করে দুশ' থেকে আড়াইশ' ব্যাগ।

এ প্রসঙ্গে কোয়ান্টাম মেথডের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রাণচিৎ লাল শীল জানান, মূলত রক্তের প্লাটিলেট আলাদা করতে ল্যাবরেটরিতে যে খরচ হয় সেটাই নেয়া হয়। তিনি আরো বলেন, 'আমরা রক্ত বিক্রি করি না।'

ভাসমান চিকিৎসক

দিনের প্রথম ভাগে জনস্রোতে তারা কোথায় মিশে থাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। দুপুর গড়িয়ে যেতেই দেখা যায় ফুটপাত বা পার্কের কোনো কোনায় বাক্স-বোতল মাইক নিয়ে পলিথিন বিছিয়ে চিকিৎসাদানের আয়োজন করতে থাকে। মাইকে গল্প বলে, তাসের জাদু দেখিয়ে কিংবা কৌতূহলোদ্দীপক কিছু বস্তু প্রদর্শন করে লোকজন জড়ো করার প্রাণান্তকর চেষ্টা থাকে তাদের। মিরপুরে ১ নম্বর মাজারের বিপরীত দিকে বাঁধের কাছে সান্ধ্যকালীন মেলার মতো গণজমায়েত হয়। দিনমজুর শ্রেণীর লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে দুই গামলা বড় বড় জোঁক ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হেকিম মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। তার ভিজিটিং কার্ড থেকে জানা গেল, ১১ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে দেশী ঔষধালয় নামে তার দোকান আছে, প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় যখন মাজার মেলায় কথা হচ্ছিল তখন দাওয়াখানা কে চালাচ্ছে জানতে চাইলে হেকিম প্রশ্ন এড়িয়ে বলে, 'আমার বান্ধা কাস্টমাররা জানে এ সময় আমি এহানে থাহি। তারা এহানেই আইয়া পড়ে।' জাহাঙ্গীর যৌন বিশেষজ্ঞ। তার অভিজ্ঞতা ৩২ বছরের। পড়ালেখা কলকাতা হেকিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত। যদিও সে বিষয়ে কোনো প্রমাণপত্র দেখাতে পারেনি।

আর একশ্রেণীর ভ্রাম্যমাণ দাওয়াখানা আছে যেখানে ডাক্তার নেই। শুধু ডাক্তারের কণ্ঠ আছে। অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে শুদ্ধ উচ্চারণ সংবলিত ক্যাসেট বাজিয়ে আর লিফলেট দিয়ে দাওয়া বিক্রি করে। এরা যৌন মলম, দাঁতের মাজনসহ বেশ কিছু আইটেম বিক্রি করে। যার মূল্য ৫ থেকে ১০ টাকার মধ্যে। এই জাতীয় ডামি ডাক্তারখানা ভ্যান-রিকশা-মাইক্রোযোগে জনবহুল স্থানগুলোতে বিক্রি করে। এদের বিক্রি ৪-৫ ঘণ্টার। অবশ্য প্রত্যেক ভ্রাম্যমাণেরই নির্দিষ্ট এক বা একাধিক স্থায়ী দাওয়াখানা আছে। টিপু কেমিক্যাল কোম্পানি, ঢাকা, বাংলাদেশ নামক এক প্রস্তুতকারক 'রানী মলম' এভাবে মিরপুর এলাকায় বিক্রি করে। তাদের কোম্পানির কোনো ঠিকানা নেই। তাদের লিফলেটে ঢাকাজুড়ে ২০টির মতো এজেন্টের অস্পষ্ট ঠিকানা দেয়া আছে।

লিফলেট ছুঁড়ে দিয়ে উধাও

প্রতিদিন দু'হাজার লিফলেট বিতরণ করতে হয়। মাসিক বেতন ১৯০০ টাকা। প্রতিদিন খাওয়ার জন্য ৫০ টাকা দেয়া হয়। মাস শেষে ৩/৪শ' ধরিয়ে দেয়া হয়।

তথ্যগুলো জানালো আনারুল। সে ফার্মগেট ও আসাদগেট এলাকায় রোমান হারবাল কেয়ারের লিফলেট ছাড়ে। আনারুল আরো জানায়, 'ইদানীং পুলিশ লিফলেট কেড়ে নেয়। তবে মারে না। বলে দৌড় দে। এ ছাড়া কোনো অসুবিধা হয় না।' আনারুলের মতো অনেক মহিলাও অন্য পেশা ছেড়ে এ পেশায় এসেছে। শাহবাগ মোড়ে আমিনা বেগম 'হারবাল হেলথ কেয়ার'-এর লিফলেট

এসব চিকিৎসকের না আছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, না আছে শাস্ত্রজ্ঞান, না আছে সরকারি কোনো স্বীকৃতি। আইনে এদের কঠিন শাস্তির বিধান থাকলেও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রকদের নাকের ডগায়, চোখের সামনে এরা শাহী হালে মানুষ ঠকানোর কারবার চালিয়ে যাচ্ছে...

বিলি করে। আমিনা জানায়, 'আগে ভিক্ষা করতাম, অহন এইডা করি। বেতন যা পাই তাতে চলে যায়।' ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্পটে এ রকম লিফলেট বিলি করে প্রায় ৮০-৯০ জন বালক-কিশোর-মহিলা।

দূষিত পানির শরবত

কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ডে ছন্দ মিলিয়ে শরবত বিক্রি করে রহমত। সকাল ও বিকেলে দু'বার দুই বালতি শরবত বিক্রি করে সে। তার শরবতে নানা সমস্যার সমাধান হয় বলে জানালো রহমত। যৌবনশক্তি বৃদ্ধি, পেট পরিষ্কারসহ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। রহমতের মতো সারা ঢাকা শহরে প্রায় শতাধিক শরবত বিক্রেতা আছে। সদরঘাট, সায়েদাবাদ, মিরপুর পূরবী সিনিমা হলের সামনে, মগবাজার মোড়, গুলিস্তান গোলাপশাহ মাজার, খিলগাঁও রেলক্রসিং, কাওরান বাজার, গাবতলী, আমিনবাজার, কমলাপুরসহ ঢাকার বিভিন্ন মোড়ে এদের অবস্থান। খিলগাঁও রেলক্রসিংয়ের আমানত প্রায় ১২ বছর ধরে এ বিশেষ শরবত বিক্রি করছে। আমানত জানায়, বিশেষ করে রিকশাওয়ালারা তার শরবত খায়। রহমত ছন্দ মিলিয়ে বলে 'আপেল-নাসপাতি তোক্‌মা/ পেট ক্লিয়ার সুন্দর পায়খানা'। রায়ের বাজারের মোহাম্মদ ছাব্বির শরবতের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে বলছে, 'গাছের বেল-কলা, বনের মধু/কোমর ছাড়ে না নতুন বধূ'। অথচ দূষিত পানি, ভেজাল খাবার রঙ আর সামান্য কিছু ফলমূল মিশিয়ে এসব শরবত বিক্রি করা হচ্ছে। গরমের সময় এগুলো চলে বেশি। বাসায় বিশুদ্ধ পানিতে ইসুবগুলের ভুসি ভিজিয়ে রেখে শরবত তৈরি করে খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত হলেও রাস্তাঘাটের এসব শরবত পেটের পীড়াসহ নানা রোগের সংক্রমণ বাড়িয়ে দেয়।

হারিয়ে যাওয়া পেশা

বেদে সম্প্রদায়ের জনবল দিনকে দিন কমছে। ঢাকা শহরে গাবতলীতে কিছুদিন আগেও তারা অস্থায়ীভাবে বসবাস করতো। কিন্তু অভ্যন্তরীণ নৌবন্দর স্থাপন করায় তারা এখন ডাঙ্গায় উঠে এসেছে। ডাঙ্গায় থাকা ৪-৫টি ছোট্ট পরিবার এখনো সাপ-ধরা, তাবিজ-কবচ, ঝাড়-ফুঁক দিয়ে থাকে। এদের সদস্য রেশমা আর কল্পনা কলাবাগান পার্কে প্রেমিক-যুগল থেকে সাপ দেখিয়ে দু-দশ টাকা চেয়ে নেয়। রেশমা জানালো, 'ভাই পেটের দায়ে পথে নামছি'। পার্কে এ রকম চলাচল করতে সমস্যা হয় কি না জানতে চাইলে প্রথমে চুপ থাকে। তারপর খুব করুণ সুরে বলে, 'কিছু চটিমাস্তান ঝামেলা করে, তয় সাবধান থাকি।' মালিবাগ রেললাইন বস্তিতে থাকে অপর তিনটি বেদে পরিবার। তারা মালিবাগ, মৌচাক, পল্টন, মতিঝিল এলাকায় ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচ ও দাঁতের পোকা বের করে থাকে।

শিক্ষা-দীক্ষাহীন ডাক্তার

অধিকাংশ হেকিম আয়ুর্বেদী বা ইউনানি চিকিৎসক নামধারীরা এসএসসি পাস করেছেন কি না তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। শক্তি ঔষধালয়ের বিশ্বজিৎ বিশ্বাস জানালেন, 'উত্তরাধিকার সূত্রে কিংবা সহকারী থেকে ডাক্তার হওয়া যেসব ডাক্তার নিজেদের সমস্যা নিয়ে অন্যদের কাছে যায়, তারা কেমন দাওয়াই দেবে?'

গাবতলী গরু হাটের চট্টগ্রাম ঔষধালয়, কলাবাগানের মঘা ঔষধালয় কিংবা মৌচাক মার্কেটের উল্টোদিকে ডক্টরস হারবাল পয়েন্ট প্রত্যেক দাওয়াখানার ডাক্তাররা দাবি করেছে যে তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু স্থানীয়রা জানান, এরা অষ্টম শ্রেণী পাস করেছে কি না সন্দেহ আছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলাবাগানের এক চিকিৎসকের আত্মীয় জানালেন, 'কোনো জটিল রোগী পেলে আশপাশের ফার্মেসির ডাক্তার, কম্পাউন্ডার এমনকি সেল্‌সম্যানের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ওষুধ নিয়ে যায়।' তিনি আরো বললেন, 'এসব ডাক্তার আদৌ শিক্ষিত কি না কেউ খোঁজ নেয় না। আমার জানা মতে, এই কলাবাগানের হেকিমের মতো অনেক হেকিমই অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত।' তিনি জানান, সায়েদাবাদ, কাপ্তানবাজার, সদরঘাট, গাবতলী কিংবা কাকরাইল, মালিবাগ, মিরপুর, গুলিস্তান, বেগমবাজার, মগবাজার, শনির আখড়া

এলাকার রোগীদের বড় বৈশিষ্ট্য তারা প্রায় সবাই নানা প্রকার যৌন সমস্যা নিয়ে এসব ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে।

দুর্বল প্রশাসন

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশবাহিনী সচরাচর আয়ুর্বেদ হেকিমী চিকিৎসকদের ঘাঁটাতে আসে না। কখনো এসে পড়লে মিষ্টি কথা বলে দু'চারশ' টাকা দিয়ে বিদায় করে দেয়া হয় বলে জানালেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হেকিম। হোমিওপ্যাথির দোকানে পুলিশ তল্লাশি চালায় অতিরিক্ত মিথেলিন-ইথেলিন রাখছে কি না খবর নিতে। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকদের (হকার) কাছ থেকে টাকা নেয় পুলিশ। সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ডের হকার মুনির জানালো, 'হালায় (পুলিশ) পাঁচ ট্যাহা হলেও খাইবো।'

দেশের ৪২৭টি আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, ২৮৯টি এলোপ্যাথিক এবং ২৩১টি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ ওষুধ প্রশাসন। নিয়ন্ত্রণকারী এই প্রতিষ্ঠানটির দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে।

মাত্র ২৯টি জেলায় ওষুধ প্রশাসনের অফিস রয়েছে এবং বাকি ৩৫টি জেলায় তাদের কোনো কার্যক্রমই নেই বলে জানা গেছে। পরিচালকসহ সব মিলিয়ে দেশব্যাপী ৩৬১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। প্রশাসনের কিছু কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অল্পসংখ্যক দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা দিয়ে এই বিশাল অপচিকিৎসা ও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তেমন কিছু করার থাকে না। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা এ ধরনের অভিযোগ প্রায়ই পাচ্ছি। অন্তত শ'খানেক অভিযোগের তদন্ত চলছে। এছাড়া অনেকগুলো ওষুধ কোম্পানিকে আমরা নোটিশ পাঠিয়েছি।' তবে তিনি লোকবলের সংকটকে প্রধান সমস্যা বলে অভিহিত করেন।

বর্তমান অবস্থা

হেকিমি-ইউনানি চিকিৎসার নামে প্রতারণার জাল বিস্তৃত হতে থাকলেও ঢাকা শহরের ৮-১০ জন হেকিম ছাড়া আর কারো তেমন রমরমা ব্যবসা নেই। এদের পোশাক, আচার-আচরণ অত্যন্ত মানবেতর। অধিকাংশ হেকিমই আফসোস করে বলেছে যে ব্যবসা নেই। দু-একজন আসে। অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা করি। যাতে ভালো হয়ে আবার আসে। কখনো কখনো ভালো হয়ে যায়। দীর্ঘদিনের কোনো রোগ যেকোনো কারণেই হোক ভালো হয়েছে বা উপকার পেয়েছে শুনলে নিজের কাছে ভালো লাগে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন হেকিম দুঃখ করে বলেছে, 'ভাই বেকার আছিলাম। এখানে আছি, ১২০০ টাকা বেতন পাই। কিছু না পাওয়ার থেকে এই টাকা কম না।' এভাবে হেকিমি চিকিৎসার নামে এসব অপচিকিৎসা ও প্রতারণাকে বেকারত্ব মোচনের উপায় হিসেবে বেছে নিচ্ছে অনেক তরুণ। গড়ে উঠছে সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র। অন্যদিকে প্রকৃত ডিগ্রিধারী ইউনানি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা পড়েছেন বিপাকে। মানুষজন এখন তাদেরকেও প্রতারক ভাবতে আরম্ভ করেছে। অথচ বাংলাদেশে হোমিও ও ইউনানি চিকিৎসায় সুনাম দীর্ঘদিনের। হেকিম হাবিবুর রহমান, সৈয়দ আলী রেজা, তপন চক্রবর্তীর মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বরা ইউনানি ও হোমিও চিকিৎসা জনমানুষের কাছে আস্থাময় করে তুলেছিলেন। আর এখন অপচিকিৎসক-প্রতারকদের হাতে পড়ে তা ডুবতে বসেছে। প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ।